দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ … 14/11/2005
পৃষ্ঠা … ১ … কলাম … ২

এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ উপবৃত্তির টাকা নিয়ে যা চলছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ 'অমুকের ছেলে উপবৃত্তি পায়, আমার ছেলে পাবে না কেন?' –প্রাথমিক শিক্ষার উপবৃত্তি কর্মসূচীতে দুর্নীতির চেয়ে এ সমস্যাটিই এখন প্রকট। সরকার সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার বাইরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০% দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দিচ্ছে। বাদ পড়ছে ৬০ ভাগ। কিন্তু কে দরিদ্র, কে নয়? –মফস্বলে এই প্রশ্নের সমাধান বেশ কঠিন। কারণ গ্রামে

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

বিদ্যা যখন বাণিজ্য-৪

সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়ে যাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সাধারণত ভাল নয়। যাদের অবস্থা 'এতটুকু' ভাল তারাও আজকাল সন্তানকে পাঠান কিন্ডারগার্টেনে। দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে গিয়ে বেচারা প্রধান শিক্ষককে থাকতে হয় সর্বক্ষণিক তোপের মুখে, চাপের মধ্যে। একদিকে অভিভাবকের ধমক, অন্যদিকে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর এবং

(৬ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

এ যাবতকালের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মোড়ল-মাতব্বরদের খবরদারি … কথা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন নিয়ে দুর্নীতি, দলীয়করণ, মনোমালিন্য এবং বিদ্যালয় থেকে সন্তানের টিসি নেবার মতো ঘটনাও ঘটছে। উপবৃত্তি পাবার শর্তে অনেক শিশু বিদ্যালয় পরিবর্তন করছে।

মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উপবৃত্তি কর্মসূচী চালুর পর ঝরে পড়ার হার কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সংখ্যা বাড়েনি। শিক্ষার্থী না বাড়ার কারণ হিসেবে দেশের সার্বিক জন্মহার হ্রাসের কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে প্রলুব্ধকরণ প্রক্রিয়ায় ৪০ ভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে আনতে গিয়ে ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক রেষারেষি, নিজেকে দরিদ্র প্রমাণের চেষ্টা, ধরাধরি এমনকি রাজনৈতিক পরিচয়ও প্রাধান্য পাচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, উপবৃত্তি না পাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে আসা এবং তাদের পরীক্ষার ফল বা লেখাপড়া সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা থাকছে না।

উপবৃত্তি কর্মসূচীর হালচাল সরেজমিন দেখতে যাই লালমনিরহাট জেলায়। আদিতমারী থানার সাপ্টিবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ রাশেদা বেগম বললেন, গ্রামের সচ্ছল পরিবারের সন্তান সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে না। কিন্তু ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়ায় বাকি ৬০ ভাগের মধ্যে সৃষ্টি হয় নেতিবাচক মনোভাব। শিশুদের মন ছোট হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত জবাবদিহি করতে হয় ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের কাছে। তাদের কেউ ক্ষেপে যান, এমনকি ছাড়পত্র (টিসি) চেয়ে বসেন।

রাশেদা বেগম বলেন, এই সমস্যা নিরসনের উপায় সবাইকে উপবৃত্তি দেয়া, কিন্তু সেখানে বড় অঙ্কের টাকার ব্যাপার রয়েছে। তবে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের অনেকেই বলেন, টাকার অঙ্ক কমিয়ে ৫০ করা হলেও সবাইকে উপবৃত্তি দেয়া উচিত। প্রধান শিক্ষিকা জানান, ২০০৪ সালে তাঁর বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ১১৫ শিক্ষার্থী, ২০০৫ সালে হয়েছে ১০৫ জন। উপবৃত্তি চালু থাকলেও ভর্তির হার কমে যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, জন্মহার কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থী কমেছে।

সরকারী এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অদূরে কাহারীপাড়া সূফলা সতীশ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, উপবৃত্তি চালুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বেড়েছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সংখ্যা কমেছে। তিনি জানান, ২০০৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ৮১ শিক্ষার্থী, এ বছর ভর্তি হয়েছে ৬৭ জন। এর কারণ হিসেবেও তিনি জন্মহার কমে আসার কথা উল্লেখ করেন। মোজাম্মেল হক বলেন, স্কুল সংলগ্ন এলাকার সব পরিবারেরই আর্থিক অবস্থার কথা শিক্ষকদের কমবেশি জানা। তাই ৪০ ভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেকটা দুঃসাধ্য।

একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুশীল চন্দ্র রায় এবং দীনেশ চন্দ্র বর্মণ বলেন, উপবৃত্তির ফলে যাদের বিদ্যালয়ে না আসার কথা তাদের অনেকেই আসছে। উপবৃত্তির টাকায় কেউবা প্রাইভেট পড়ছে, স্কুল ড্রেস বানাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন একজন অভিভাবক প্রশ্ন করেন অমুকের মতো আমিও গরিব, আমার ছেলে পাবে না কেন?

সরকার এই প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় শ্রেণী কক্ষের চেয়ে উপবৃত্তি নিয়ে শিক্ষকদের টেনশন থাকে বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন অফিস সহকারী না থাকায় পুরো কাজই করতে হয় শিক্ষকদের। আলাদা হাজিরা খাতা, রেজিস্ট্রার খাতা সংরক্ষণসহ নানা কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় তাঁদের। উপবৃত্তি কমিটিও অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। কিভাবে? অনুসন্ধানে জানা যায়, কোন স্কুলের শিক্ষার্থী তিন শ', উপবৃত্তি প্রাপ্য ১২০ জন। কমিটির চেয়ারম্যান বা সদস্য অথবা স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিক দাবি করে বসেন ১৬০ জনকে উপবৃত্তি দিতে হবে। অতিরিক্ত ৪০ জনকে উপবৃত্তি দিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন শ' থেকে বাড়িয়ে কাগজে ধামাবাজির আশ্রয় নিতে হয়। কমিটি বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে এটা করতে গিয়ে নানা রকম জালিয়াতির আশ্রয় নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অনেক সময় অযোগ্য শিক্ষার্থীকেও শর্ত লঙ্ঘন করে উপবৃত্তি দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।

এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তি কর্মসূচীতে দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলছে। গত ২০ এপ্রিল ২০০৫ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির জন্য মনোনীত হতে গড়ে ৪০ টাকা খরচ করেছে এমন শিক্ষার্থীর শতকরা ৩২ দশমিক ৪ ভাগ, টাকার অঙ্কে অবৈধ আদায়ের পরিমাণ ৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। জরিপে আরও বলা হয়েছে, শতকরা ৫ ভাগ শিক্ষার্থীর অভিযোগ হলো তারা সরকার নির্ধারিত উপবৃত্তির টাকা পুরোপুরি পায়নি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের গত ১২ মার্চ ২০০৫ প্রকাশিত পঞ্চম এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি তিন মাস অন্তর উপবৃত্তি বাবদ ৩০০ টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী ৩০০ টাকার বদলে ২০০ বা তারও কম টাকা পেয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ উপবৃত্তি বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা দেন, দেশে একটি শিশুও নিরক্ষর রাখা হবে না। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রথম একনেক সভায় প্রায় ৩৩১২ কোটি টাকার এই প্রকল্প (২০০২-২০০৭) চালুর সিদ্ধান্ত হয়। এর আওতায় প্রাথমিকের এক শিক্ষার্থীকে মাসে ১০০ টাকা এবং একই পরিবারের দুই শিশু হলে ১২৫ টাকা দেয়া হচ্ছে। সুবিধাভোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫৫ লাখ। চালুর প্রায় আড়াই বছর পর অনুসন্ধানে দেখা যায়, চাল বা গম বিতরণে দুর্নীতি যতটা ছিল নগদ টাকা দেবার বেলায় তা তুলনামূলক কম। কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির আধিক্য রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটনাও ঘটছে।

আতপাড়ার একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তির শর্ত পূরণ করতে না পারায় তালিকা থেকে বাদ পড়ে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবারও তালিকাভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয় দু'হাজার টাকা। উপবৃত্তি চালু হলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আবার ২৫ টাকা হারে কর্তন করে ঘুষের এই টাকা তোলা হয়। স্থানীয় একটি সাপ্তাহিকে খবরটি প্রকাশের পর প্রধান শিক্ষক বিপাকে পড়েন। নিজে সেদিনই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ২৫ টাকা করে ফেরত দেন। স্বাধীনতা দিবসে নীলফামারিতে উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০ টাকা চাঁদা আদায়ের ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি উপবৃত্তি প্রকল্প অফিসে এসেছে অভিযোগ আকারে।

পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অনিয়ম সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রকল্প পরিচালক একেএম মাহবুব উল আলম বলেন, উপবৃত্তি প্রকল্পে স্বচ্ছতাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরাসরি মায়ের হাতে পৌঁছে চেক, মা নিজেই ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন। এই টাকা নেবার পর অভিভাবক যদি কাউকে কিছু দেয়, সেটি তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু টাকাটা তার হাতেই আগে যাচ্ছে, যেটি আগে কখনই ছিল না।

শতকরা ৪০ ভাগ শিশুকে উপবৃত্তি দেয়া সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সরকারী হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে ৩৭ ভাগ মানুষ, সেই হিসাবে ৪০ ভাগ পরিবারকে দরিদ্র বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উপবৃত্তি কোন রিলিফ নয়, নির্বাচিত হবার পর পরীক্ষায় ৪০ ভাগ নম্বর, শ্রেণীকক্ষে ৮৫ ভাগ হাজিরা, ১০ ভাগ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রেরণসহ বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করলেই এই সুবিধা দেয়া হবে। তিনি দাবি করেন, সরকারী হিসেবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৩৩ ভাগ হলেও উপবৃত্তি চালুর পর তা শতকরা ২৭ ভাগে নেমে এসেছে। এছাড়া ১৯৯০ সালে এনরোলমেন্ট যেখানে ছিল ৭৬ ভাগ, সেখানে এই হার এখন ৯৭।